আসুন আলোর পথের অভিযাত্রী হই

মুহা. শিপলু জামান

স্বাধীনতার আলোর মশাল হাতে নিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ নয় মাস পর পাকিস্তানের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন মাতৃভূমিতে সগৌরবে ও বীরদর্পে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন স্বাধীন বাংলাদেশে, মুক্ত বাতাসে, জনতার সমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর পদার্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিলো। সেদিন থেকে বাংলাদেশ যাত্রা করেছিলো 'অন্ধকার থেকে আলোয়', 'পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায়' ও 'নিরাশা থেকে আশায়', 'অন্যায় থেকে ন্যায়' এর পথে ।তাই ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও আনন্দের দিন, প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ বিজয়ের দিন। আর এই বিজয় অর্জন করতে, জাতির পিতার নেতৃত্ব বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়, অত্যাচার আর জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন– সংগ্রাম করেছে, বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্গবন্ধু বহুবছর জেল খেটেছেন – সয়েছেন নিদারুণ কষ্ট ও নির্যাতন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসীম রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও দূরদর্শী নেতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালির বিজয় সন্নিকটে এবং বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্খা আকাশচুম্বী– শুধু প্রয়োজন একটি আহ্বান, একটি নির্দেশনা। তাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতাকে শুনিয়েছিলেন অমর কবিতা,

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এই ভাষণ ছিলো স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও অনুপ্রেরণার উৎস। মূলত এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন এবং মুক্তিপাগল জনতা দেশ স্বাধীনের প্রস্তুতি নিয়েছিলো। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্বপরিকল্পিতভাবে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি জাতির উপর শুরু করে এক নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। সেই প্রেক্ষাপটে অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পরার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য ছিলো হুমকিস্বরূপ, তাই স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর তাঁরা ধানমন্ডির ৩২ নং বাসা থেকে বঙ্গবন্ধুকে আটক করে পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরিন করে।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধুকে আটক করলে, তাঁর ও বাঙালি জাতির মনোবল ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু বীর বাঙ্গালিরা সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেই তাকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত হয় প্রবাসী সরকার যা 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচালিত হয়। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস এদেশের আপামর জনগণ মুক্তিযুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। আর অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী প্রহসনের বিচারে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ দেয়, তাঁর কারাগারের পাশেই তাঁর জন্য কবর খুঁড়ে। কিন্তু তাঁরা মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে বিন্দু পরিমাণও বিচলিত করতে পারে নাই। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে হিমালয়ের মতো অটল, অবিচল। তাঁরা মনে করেছিলো ফাঁসির আদেশ দিয়ে তারা বঙ্গবন্ধুকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে পারবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসীম সাহসী, ন্যায়ের প্রশ্নে তিনি ছিলেন প্রস্তর কঠিন ও অটল। ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত জেনেও বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর সাহস, বাংলাদেশ ও বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় ও প্রেরনার উৎস।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার সর্বস্তরের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় অর্জন করে। সেদিন ৯৫ হাজার পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে। বিজয় অর্জন হলেও দেশের মানুষের কাছে তা ছিলো অতৃপ্ত ও অপূর্ণ। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার প্রাণপুরুষ, বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বিজয়োল্লাস ও বিজয় আনন্দ করা জনগণের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। রাজনীতির মহাকবি ও স্বাধীনতার শিল্পী ছাড়া বিজয় কবিতাটি লেখা সম্পন্ন হচ্ছিলো না। তাই পুরো জাতি অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলো মহান নেতার দেশে ফেরার। অন্যদিকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন হলেও স্বাধীনতার কান্ডারি বঙ্গবন্ধু তখনো কিছুই জানতেন না, পাকিস্তানিরা তাকে সকল প্রকার তথ্য ও সংবাদ মাধ্যম থেকে দূরে রেখেছিলো। ১৯৭২ সালের পহেলা জানুয়ারি সন্ধ্যায় ভুট্টোর সাথে সাক্ষাতকালে বঙ্গবন্ধু জানতে পারেন, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সাথে বাংলার মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পরবর্তীতে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার, ভারত ও রাশিয়াসহ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিশ্ব জনমতের চাপের নিকট নতি স্বীকার করে, ০৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। একদিকে যুদ্ধে পরাজয়, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া বিষয়টি পাকিস্তানিরা সহজে মেনে নিতে পারছিলো না। তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির পর সরাসরি বা ভারত হয়ে দেশে ফিরতে দিতে চায় নাই। তারা বঙ্গবন্ধুকে ইরান অথবা তুরস্ক হয়ে দেশে ফেরার প্রস্তাব করে, বঙ্গবন্ধুও তাঁদের কথা মানেন নাই, তিনি বেছে নিয়েছিলেন লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে দেশে ফেরার পথ।

৯ জানুয়ারি ভোরে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের বিমানে করে বঙ্গবন্ধু নামেন লন্ডনে এবং সেখানে তিনি ‘মে ফ্লাওয়ার ক্লেরিজ’ হোটেলে অবস্থান করেন। হোটেল থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে কথা বলে দেশের খবর নেন। ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডোয়ারথ হিথ অবকাশে ছিলেন বিদেশ সফরে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কথা শুনে তিনি সফর সংক্ষিপ্ত করে সেদিনই লন্ডনে ফিরেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্র যাকে ব্রিটেন তখনো স্বীকৃতি দেয় নাই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশাল মাপের নেতা ছিলেন যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে ছুটে এলেন এবং বঙ্গবন্ধুর নিরাপদে দেশে ফেরার জন্য রয়্যাল এয়ারফোরসের ভিআইপি সিল্ভার কমেট জেটের ব্যবস্থা করলেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে বহন করা ব্রিটিশ বিমান, সাইপ্রাস ও ওমানে জ্বালানি বিরতি নিয়ে ১০ জানুয়ারি সকালে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর) পৌছায়। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। লন্ডন থেকে দিল্লীর এই যাত্রা পথে বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ বেছে নিয়ে গাওয়া শুরু করেন। দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সেনা ফেরতসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ভারত সরকার তাঁদের রাষ্ট্রপতির রাজহংস বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশে পাঠানোর সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু অসীম জ্ঞান আর বিচক্ষনতাসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু সসম্মানে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বিমানেই দেশে ফেরেন।

পরে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি দুপুর বেলা, বঙ্গবন্ধু সসম্মানে, মাথা উচু করে, বীরের বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন ইতিহাসের মহামানব, দেশ ফিরে পায় তাঁর প্রিয় সন্তানকে, জাতি ফিরে পায় তাঁদের মহান নেতা জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে। লক্ষ লক্ষ জনতা সেদিন ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে সম্ভাষণ জানিয়েছিলো প্রিয় নেতাকে, ঢাকার রাজপথ পরিণত হয়েছিলো জনসমুদ্রে। তাই এই দিনটি আমাদের কাছে অত্যান্ত মহিমাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশের মানুষের কাছে ফিরতে পেরে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আবেগাপ্লুত, তাঁর চোখে ছিলো আনন্দ-অশ্রু। দীর্ঘ দশ মাস পর দেশে ফিরেও তিনি পরিবারের কাছে না যেয়ে প্রথম ছুটে গিয়েছিলেন বাংলার মানুষের কাছে। সেদিন স্বদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাঁদের নিকট নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।“ আসুন বঙ্গবন্ধু থেকে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার শিক্ষা গ্রহণ করি এবং ন্যায়ভিত্তিক দীপ্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি”। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা “সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি”উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, “আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটেনা। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমান করেছে, তাঁরা বীরের জাতি, তাঁরা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে”।

বঙ্গবন্ধু সেদিন সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে কিন্তু ষড়যন্ত্র শেষ হয়নাই তাই তিনি সবাইকে একতা বজায় রাখতে বলেছিলেন।আমরা এবছর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছি সেই সাথে উদযাপন করছি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী বা ‘মুজিব বর্ষ’; স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও দেশ বিরোধী বিভিন্ন চক্র সক্রিয় আছে, তাই আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে। দেশ বিরোধী যেকোন চক্রান্ত সবাই মিলে প্রতিহত করবো - এই হোক মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার।

সেই দেশ বিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথ রোধ করতে চেয়েছে; ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে মানবতার প্রতিক শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু তাঁরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন ধ্বংস করতে পারে নাই। আল্লাহর অশেষ রহমতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সোপান বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত “রূপকল্প-২০২১” ও “রূপকল্প - ২০৪১” বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, আধুনিক ও উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারবেন– ইনশাল্লাহ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে; বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে এগিয়ে রয়েছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।এই দেশ আমার, আপনার, সবার। আসুন সবাই আলোর পথের অভিযাত্রী হই। শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করি প্রিয় মাতৃভূমি, বাংলাদেশকে।

#

১০.০১.২০২১ পিআইডি ফিচার